بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ মোতাবেক ১৬ ফাতাহ, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজকাল, আমরা ইসলামী মাস রবিউল আউয়াল অতিবাহিত করছি। যদিও সমগ্র ইসলামী বিশ্বেই এ মাসের গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু পাক-ভারত উপমহাদেশে এর বিশেষ গুরুত্বের কারণ হল, এতদঞ্চলে এ মাসটি মহা সমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। কেননা, এ মাসের ১২ তারিখে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভ জন্ম হয়েছে, একটি গবেষণা থেকে এটি বলা হয়। কিন্তু হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) 'সীরাতে খাতামান্নাবীঈন' পুস্তকে এটিও লিখেছেন যে, মিশরীয় একজন পণ্ডিতের গবেষণা অনুসারে ৯ রবিউল আউয়াল মহানবী (সা.)-এর জন্মগ্রহণ করেছেন। **[সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম. এ. (রা.), পৃ: ৯৩]**

যাহোক 'রবিউল আউয়াল' সেই মাস যে মাসে আমাদের মনিব এবং মহামান্য নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভ জন্ম হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা দেখে আক্ষেপ হয় কেননা, তারা এ দিনটি মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য অনুগ্রহকারী রসূল (সা.)-এর জন্মদিবস উপলক্ষে উদ্‌যাপন করলেও তারা নিজেরাই **قُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ (সূরা আল্ হাশর: ১৫)** অর্থাৎ, তাদের হৃদয় বহুধা বিভক্ত- উক্তির সত্যায়নস্থলে পরিণত হয়ে আছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের গন্ডির যে বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন তা হল, **رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (সূরা আল্ ফাতাহ্: ৩০)** অর্থাৎ, তারা পরস্পরের প্রতি অতীব দয়ার্দ্র। অথচ দয়া প্রদর্শন তো দূরের কথা, এদের অধিকাংশই পরস্পরের রক্ত পিপাসু। প্রতিদিন সংবাদ আসে, শত শত মুসলমান নিহত হচ্ছে মুসলমানদেরই হাতে। আর এই বিষয়টি এমন, যা আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। তারা যদি নিজেদের মাঝে অন্যায়-অত্যাচার করে বেড়ায়, তাহলে করুক। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এ সবই হচ্ছে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নামে। মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করছে আল্লাহ্ এবং রসূলের নামে। সেই খোদা, যিনি বিশ্ব প্রভু-প্রতিপালক, যিনি রহমান, রহীম আর সেই রসূল (সা.), যিনি **'রহমাতুল্লিল আলামীন'** বা বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ, তাঁদের নামে অন্যায়, অবিচার আর বর্বরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অসহায় নারী, শিশু এবং নিষ্পাপ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হচ্ছে, বস্ত্রহীন অবস্থায় এবং অনাহারে তাদেরকে জীবনযাপনে বাধ্য করা হচ্ছে, নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। এক কথায়, ধৃষ্টতার সাথে নির্লজ্জতার বেসাতি করে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নামে এ সব করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা

বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে একজন মুসলমানকে হত্যা করা তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। নিরপরাধ কোন মানুষকে হত্যা করলে জাহান্নামের অগ্নি এড়াতে পারবে না। কিন্তু ধর্মের ঠিকাদার ও স্বার্থপর এই নেতারা অতি সরল এবং স্বল্পজ্ঞানী মুসলমানদের জান্নাতের লোভ দেখিয়ে এমন হীন কাজে উদ্বুদ্ধ করছে। ইসলামকে এরা এতটাই দুর্নাম করছে যে, আজ অ-মুসলিম বিশ্বে ইসলামের নাম শুনলেই প্রথমে তাদের মাথায় যে চিত্র আসে, তা হল নিপীড়ন, নির্যাতন এবং বর্বরতা। অবশ্য একটি ক্ষেত্রে এসব নামধারী মুসলমান নেতারা সমবেত হয়ে পরস্পরের সাথে সহযোগিতার আলোচনা ও নসীহত করে থাকে আর তা হল, সেই বিষয়, যার বিরুদ্ধে খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.) সুস্পষ্ট আদেশ জারী করে রেখেছেন।

আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, মুসলমানদের অবস্থা যখন এমন হবে, মুসলমানদের হৃদয় যখন এভাবে বহুধা বিভক্ত হবে, قُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ (সূরা আল্ হাশর: ১৫) এর অবস্থা হবে, মুসলমানরা যখন পরস্পরকে জবাই করবে আর নামধারী আলেমদের কাছে হিদায়াতের জন্য যাবে, যাদের সম্পর্কে এদের ধারণা যে, এরা হিদায়াতপ্রাপ্ত, কিন্তু তারা সেসব আলেমকে এমন অপকর্মে লিপ্ত পাবে, যেসব অপকর্ম মানুষকে খোদা থেকে দূরে নিয়ে যায়। বরং সাধারণ আলেমদের চেয়েও তাদের অবস্থা হবে নিকৃষ্ট। মহানবী (সা.) বলেছিলেন, عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ। অর্থাৎ, তাদের আলেম সমাজ আকাশের নিচে বসবাসকারী সকল সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হবে। (আল্ জামেয়ু লেশেবেল ঈমানে লিলবাইহাকী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭-৩১৮) কিন্তু কেন? তিনি (সা.) বলেন, এর কারণ হল, এরা নৈরাজ্যবাদী আলেম আর এদেরই মধ্য থেকে নৈরাজ্যের সূচনা হবে। আর আজ আমরা আলেমদের সংখ্যা গরিষ্ঠের মাঝে এমনটিই দেখতে পাচ্ছি। আগুন নিভানোর পরিবর্তে এরা আগুন লাগিয়ে থাকে। অতএব, তিনি (সা.) এই অবস্থার চিত্র অঙ্কন করে বলেছেন, ইসলামের জন্য নিজেদের হৃদয়ে দরদ রাখে, এমন মুসলমানরা যেন এহেন পরিস্থিতিতে নিরাশ না হয়। কেননা, এমন সময়ে মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী আসবেন, যিনি তার মনিব এবং মহামান্য নেতার পূর্ণ অনুগত দাস হিসেবে মুসলমান এবং অ-মুসলমান সবাইকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করবেন আর ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর ও সমুজ্জ্বল শিক্ষা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করবেন এবং মুসলমানদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করবেন। কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, এসব আলেম [মহানবী (সা.)-এর] এ কথা অস্বীকার করে আর সাধারণ মানুষ ও সাধারণ মুসলমাদেরকে ভ্রান্ত কথা বলে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। এভাবে তারা মানুষের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদেরকে তারা এমন সব কথা বলে, যার কোন অস্তিত্বই নেই।

সব মুসলমানের এই বিশ্বাস রয়েছে আর এর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া কোন মুসলমান মুসলমানই গণ্য হতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান্নাবীঈন এবং শরীয়ত তাঁর

সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু নৈরাজ্যবাদী এ সব মৌলভী সাধারণ মুসলমানদের একথা বলে উত্তেজিত করে তুলে যে, আহমদীরা খতমে নবুয়্যতের বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। এর জন্য 'ইন্না লিল্লাহ্' পড়ে لَّعْنَت اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ বলা ছাড়া আর কিছুই বলার নেই। যে ব্যক্তি আহমদী আখ্যায়িত হয়েও এই কথায় বিশ্বাস রাখে না যে, মহানবী (সা.) খাতামান্নাবীঈন, সে অবাধ্য, বিদ্রোহী, অনাচারী, দুরাচারী এবং ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত। আর এমন ব্যক্তির সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কোন সম্পর্ক বা সংস্রব নেই। হ্যাঁ! এ কথা সত্য যে, আহমদীরা 'খতমে নবুয়্যত'-এর সেই অর্থ করে, যা স্বয়ং মহানবী (সা.) করেছেন আর কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা সে বিষয়ই বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব এবং তাঁর শরীয়তের গন্ডী বহির্ভূত হয়ে এখন কোন নবীই আর আসতে পারবে না।

একবার মহানবী (সা.) বলেছেন, আবু বকর এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তবে হ্যাঁ! কোন নবীর আগমন ঘটলে তবে তা ভিন্ন কথা। **(কনযুল উম্মাল, ১১তম খণ্ড, পৃ. ২৫১, কিতাবুল ফাযায়েলে যিকরে সাহাবা ওয়া ফাযলেহিম, হাদীস নম্বর ৩২৫৭৫, মুদ্রণ-দারুল কুতুবুল আলামিয়া, বৈরুত ২০০৪ইং)**

অতএব, তিনি (সা.) নবুয়্যতের পথ বন্ধ করেন নি। তবে (এ কথা সঠিক যে,) তিনি (সা.)-এর গণ্ডির বাহিরে থেকে কেউ আর আসতে পারে না এবং নতুন কোন শরীয়তও অবতীর্ণ হতে পারে না। আর আমরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে যে মসীহ্ ও মাহদী হিসেবে নবীরূপে মান্য করি, তা তাঁর (সা.) পূর্ণ দাসত্বের গণ্ডির মাঝে রেখেই সে বিশ্বাস রাখি। আর পুরোনো আলেমদেরও একই বিশ্বাস ছিল।

যেমন, হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলভী 'তফহীমাতে ইলাহিয়া' পুস্তকে লিখেন, "আমার সত্তায় নবুয়্যত সমাপ্ত করা হয়েছে [মহানবী (সা.)-এর এ কথা]-এর অর্থ কেবল এটি নয় যে, এমন কোন ব্যক্তি আসবে না, যাকে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য শরীয়ত সহকারে পাঠাবেন। **(আত্ তাফহিমাতে ইলাহিয়া, রচয়িতা, শাহ্ ওলী উল্লাহ্ হেদলভী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫, মাকতুবা হায়দারী লাহোর, ১৯৬৭ইং)** বরং এর অর্থ হল, শরীয়তধারী কোন নবী আসবে না, কিন্তু শরীয়ত বিহীন আসতে পারে।

অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, মহানবী (সা.)-কে খাতামুল আম্বীয়া অবশ্যই বল কিন্তু এ কথা বলো না যে, তাঁর পর কোন নবী নেই। **(আদ্ দুর্‌রে মানসুর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৪, তফসীর সূরা আহযাব, মুদ্রণ- দারুল মা'রেফা, বৈরুত)**

অতএব, আমরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে মসীহ্ মওউদ মেনে নবীর যে মর্যাদা দিয়ে থাকি, তা দিয়ে থাকি মহানবী (সা.)-এর প্রতি তার দাসত্ব বরণের কল্যাণে। অতএব, বিভিন্ন সময় আলেমরা সাধারণ মুসলমানদেরকে স্পর্শকাতর এই কথা বলে উত্তেজিত করে তুলে যে, কাদিয়ানীরা মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কে নবী মানে, অথচ তাদের এই কথাগুলো নৈরাজ্য বা অশান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পাকিস্তান সরকার এটি নিয়ে গর্ব করে যে, তারা তখন আইন পাশ করে খতমে নবুয়্যত সংক্রান্ত নব্বই বছরের পুরোনো সমস্যাটির সমাধান করেছে। আর এখন তো ১২৫ বছর কেটে গেছে। আর এ বিষয়ে পাকিস্তানের আলেম সমাজ এবং কোন কোন সরকারী কর্মকর্তাও সাধারণ মানুষের অনুভূতিতে সুরসুরি দিয়ে উত্তেজিত করে। এটি তাদের সেই অবস্থা, যা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাদের এ সব আলেমের কথা না শুনে সাধারণ মুসলমানদের এটি খতিয়ে দেখা উচিত যে, বর্তমান যুগ কি এক সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে না, যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যিনি এসে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করবেন? নিঃসন্দেহে এটিই সেই যুগ আর খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে কিন্তুতাদের আলেমরা এ সব কথা মানবে না। কেননা, মিম্বর তাদের হাত ছাড়া হবে এবং তাদের রুটি-রুজিও বন্ধ হয়ে যাবে। এরাই মুসলমানদেরকে ক্ষেপাতে থাকবে আর যেমনটি আমি বলেছি, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আইনও তাদেরকে বল্গাহীন ছেড়ে দিয়ে রেখেছে। তাই এই অপবাদের ভিত্তিতে তারা বিভিন্ন সময়ে মিছিল, সমাবেশ এবং কটু ভাষায় গালিগালাজ করতেই থাকে। তবে এই দুরাচারিতা ও দুরাচরণ ঐ মৌলভীদেরই সাজে। তারা এমনটি করতে পারলেও আহমদীরা এমন অপকর্মের মোকাবিলা করতে পারে না।

১২ই রবিউল আউয়ালের প্রেক্ষাপটে রসূলের সম্মান এবং খতমে নবুয়্যতের নামে কয়েকদিন (অর্থাৎ চারদিন) পূর্বে পাকিস্তানের দুলমিয়ালে কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক এবং মৌলভীরা সমবেত হয়ে মিছিল বের করে এবং আমাদের মসজিদে আক্রমন করে। মসজিদে আহমদীরা ছিল, তারা তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেয় নি, দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু পুলিশের কথায় আহমদীরা যখন দরজা খুলে দেয় আর পুলিশের এই নিশ্চয়তা সাপেক্ষে দরজা খোলা হয় যে, তারা মসজিদের হিফাযত করবে, তখন এসব উচ্ছৃঙ্খলের দল মসজিদে ঢুকে পড়ে আর পুলিশ তা দেখেও না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে যায়। এরপর, মসজিদের বিভিন্ন আসবাপত্র বের করে তাতে তারা আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং তাদের নিজস্ব ধারণামতে ইসলামের অনেক বড় সেবা করেছে বলে তারা আত্মপ্রসাদ নেয়।

যাহোক, আমরা আইনের বিরুদ্ধে যাব না আর যাইও না। ইহজাগতিক উপায়-উপকরণের যতটা সম্পর্ক আছে, সেটির তোয়াক্কা আমরা করি না, তারা ক্ষতি করেছে বটে, তা করুক। কিন্তু আমাদের ঈমান, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ এবং তওহীদ বা একত্ববাদকে হৃদয়ে গ্রথিত ও ধারণ করার যতটা সম্পর্ক আছে, এ জন্য আমরা নিজেদের প্রাণও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এখান থেকে আমরা কিছুতেই পিছু হটব না। আমরা সব সময় এটিই বলে আসছি আর এর জন্য ত্যাগও স্বীকার করে আসছি যে, **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'**-এ ঘোষণা করা থেকে কখনোই আমরা বিরত হব না।

এরা প্রথাগতভাবে একত্রিত হয়ে মিলাদ-মাহফিল করে থাকে। পাকিস্তানে এদের অধিকাংশ বক্তৃতায় আহমদীদের গালিগালাজ করা ছাড়া আর কিছুই হয় না। কিছু সময় ধরে তারা নোংরা কথাবার্তা বলতে থাকে এবং বিষোদগার করে আর মনে করে, এভাবেই তারা ইসলামের অনেক বড় সেবা করেছে। কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত তো ইসলামের সত্যিকার সেবার দায়িত্ব প্রথমবার স্বীয় কাঁধে তখন তুলে নিয়েছে, যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাবি করেছেন। আর তিনিও একথাই বলেছেন, তওহীদ বা একত্ববাদ এবং মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি এসেছি। ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুনর্বাসন আমার মাধ্যমেই হবে। এরপর আহমদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় খলীফার যুগে অমুসলমানরা যখন মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকে অপলাপ করে এবং অত্যন্ত নোংরা ভাষায় লেখালেখি আরম্ভ করে, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ব্যাপক পরিসরে ভারতবর্ষ জুড়ে 'সীরাত সম্মেলন' আয়োজন করেন। আর তিনি আহমদী এবং অ-আহমদী সবাইকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, চলুন! ভেদাভেদ ভুলে এখন সবাই সম্মিলিতভাবে মহানবী (সা.) এবং ইসলামের সুরক্ষাকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করি আর এভাবে তিনি ব্যাপক পরিসরে এই সম্মেলনের সূচনা করেন। উপরন্তু ভদ্র অমুসলমানদেরকেও তিনি এতে আমন্ত্রণ জানান। মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান রাখা এবং তাঁর সম্মান ও সম্ভ্রমের হিফাযত করা তো মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর অনুগ্রহ সমগ্র বিশ্বে ছেয়ে আছে। সারা বিশ্বের জন্য তিনি আশীর্বাদ, তাই অমুসলমান ভদ্র শ্রেণীর মানুষজনও যেন তাঁর (সা.) জীবনী বা আচরিত জীবন সম্পর্কে আলোচনা করে। অতএব, শিক্ষিত অনেক অমুসলমান রয়েছেন, যাদের মাঝে হিন্দুরাও অন্তর্ভুক্ত, তারা মহানবী (সা.)-এর জীবন-চরিত নিয়ে প্রবন্ধ ও সন্দর্ভ পাঠ করেন। ১৯২৮ সনে কাদিয়ানে এই সম্মেলন যখন প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেখানে হিন্দু কবিদের রচিত দু'টো না'তও পাঠ করা হয়। **(তারিখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৩)**

যেমনটি আমি বলেছি, সমগ্র ভারত জুড়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর প্রেরণা ও আহ্বানে 'সীরাত সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্বাসগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তখন অ-আহমদী আলেম সমাজ, (যদিও তাদের কতক ব্যক্তি এ প্রচারাভিযানের বিরোধিতাও করেছিল, তথাপি) তাদের অনেকেই এমন ছিল, যারা এই পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টাকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়েছে। আর পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে মন্তব্যও প্রকাশিত হয়েছে এবং অনুষ্ঠানের সংবাদও প্রকাশ করা হয়েছে।

একটি পত্রিকা হল, গৌরকপুর থেকে প্রকাশিত 'মাশরেক'। ১৯২৮ সনের ২১ জুন সংখ্যায় তারা লিখেছে, ভারতবর্ষে এটি একটি অমর ইতিহাস হয়ে থাকবে। কেননা, এই তারিখে কোন না কোন ভাবে মুসলমানদের সকল ফির্কাই সম্মানিত রসূল ও দু'জাহানের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-

এর স্মৃতিচারণ করেছে। আর সব শহরই চেষ্টা করেছে, তাদের শহর যেন প্রথম স্থানে থাকে। যারা এ সময় ভেদাভেদ এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পোষ্টার লিখেছে (কিছু লোক এমনও ছিল যাদের কাজই হল, বিরোধিতা করা।) এবং বক্তৃতা লিখে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছে, (অর্থাৎ, পত্রিকায় পাঠিয়েছে) তারা আসলে চরম আহাম্মক ও নির্বোধ। সংবাদ পরিবেশক বলেন, যারা আমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত নয়, তারা চরম নির্বোধ। আমাদের বিশ্বাস হল, যে ব্যক্তি **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'**-য় বিশ্বাস রাখে, সে সফল ও মুক্তিপ্রাপ্ত। তিনি আরো লিখেন, ১৭ জুন জলসার সফলতার জন্য আমরা জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম জনাব মির্যা মাহমুদ আহমদকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যদি শিয়া, সুন্নি এবং আহমদীরা এভাবে বছরে দু'চার বার এক জায়গায় সমবেত হয়, তা হলে কোন অপশক্তিই এ দেশে ইসলামের বিরোধিতায় দাঁড়াতে পারবে না।

আরেকটি পত্রিকার নাম হল- 'সুলতান'। এটি কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি একটি বাংলা পত্রিকা। এ পত্রিকার ২১ জুন সংখ্যায় লেখা হয়েছে, জামা'তে আহমদীয়া ১৭ জুন তারিখে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী তুলে ধরার জন্য সমগ্র ভারতে সমাবেশ করেছে। আমরা সংবাদ পেয়েছি, প্রায় সর্বত্রই সফল সমাবেশ হয়েছে। আর এটি সত্য কথা যে, এ ক্ষেত্রে আহমদীরা এমন অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে, যা ইতিপূর্বে কখনো লাভ হয় নি আর এটি থেকে বুঝা যায়, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিনিয়ত শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিচ্ছে। আর আমরাও এই শক্তির কথা স্বীকার করি এবং তাদের সাফল্য কামনা করি। **(তারিখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৭-৩৮)**

সে সময়কার পত্র-পত্রিকা একথা লিখেছে আর অ-আহমদী এবং অমুসলমানরাও সঙ্গ দিয়েছে। কেননা, এটি মহানবী (সা.)-এর সম্মানের প্রশ্ন ছিল। কারো পক্ষ থেকে সাধুবাদ নেয়ার প্রয়োজন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নেই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর এই কর্ম-প্রচেষ্টার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের শত্রু এবং মহানবী (সা.)-কে যারা হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে, তারা যেন বুঝতে পারে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা কত উচ্চ? আর এটিও স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য যে, এ ক্ষেত্রে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ। কাদিয়ানে কতক হিন্দুও মহানবী (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে বক্তৃতা করেছে। আল্ ফযল পত্রিকা তখন বিশেষ করে খাতামান্নাবীঈন সংখ্যা প্রকাশ করেছে। **(তারিখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩)** আর তখন থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নিয়মিত 'সীরাতুন্নবী জলসা'র আয়োজন করে আসছে। তিনি যে চার-পাঁচটি পয়েন্ট দিয়েছিলেন সেগুলোর একটি হল, শুধু ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে নয়, বরং গোটা বছর জুড়েই বিভিন্ন সময় 'সীরাতুন্নবী জলসা' অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। **(তারিখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১)**

যাহোক, এই হল জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাস। এখনও জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর এখন তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর দু'শতাধিক দেশে, যেখানেই আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সেখানে এ জলসা অনুষ্ঠিত হয়। আর এখন কেবল আহমদীরাই রয়েছে এবং থাকবেও ইনশাআল্লাহ্, যারা খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্যাদা ও মর্ম বুঝে আর মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে পৃথিবীবাসীকে অবহিত করছে। এর কারণ হল, এ যুগের ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.) আমাদেরকে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছতে হলে মহানবী (সা.)-এর আঁচল আঁকড়ে ধর। কেননা, তিনিই এখন মুক্তির একমাত্র পথ, এছাড়া মুক্তির অন্য কোন মাধ্যম নেই। তিনি (আ.) বলেন, **'ওহ্ হ্যাঁয় ম্যায় চিজ কিয়া হু'**, (অর্থাৎ, তিনিই সব কিছু আমি কিছুই নই)। **(কাদিয়ানকে আরিয়া আওর হাম, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ.৪৫৬)**

তিনি (আ.) নিজেকে কখনো বড় বলেন নি বা বড় বলে দাবি করেন নি। সব সময় মহানবী (সা.)-এর মাহত্ম্যই বর্ণনা করেছেন। আর এই যে অপবাদ রয়েছে যে, আমরা মহানবী (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মানি না, এর খণ্ডনে তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, "এটিও স্মরণ রাখা উচিত, আমার এবং আমার জামা'তের প্রতি এই যে অপবাদ আরোপ করা হয়, আমরা মহানবী (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মানি না, এটি আমাদের প্রতি এক জঘণ্য অপবাদ। আমরা যে ঈমানী শক্তি, তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে মহানবী (সা.)-কে 'খাতামুল আম্বিয়া' মানি এবং বিশ্বাস পোষণ করি, তার লক্ষ্য ভাগের এক ভাগও অন্যরা মানে না আর তাদের সেই যোগ্যতাও নেই। খাতামুল আম্বিয়ার খতমে নবুয়্যতে অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও গূঢ় রহস্য তারা একেবারেই বুঝে না। এরা কেবল নিজেদের পিতা-পিতামহের কাছে একটি শব্দ শুনে রেখেছে, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ এবং তত্ত্ব সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। আর জানে না, খতমে নবুয়্যত কাকে বলে? আর এতে ঈমান আনার অর্থ এবং মর্ম কী? কিন্তু আমরা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে, (যা আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন,) মহানবী (সা.)-কে খাতামুল আম্বিয়া হিসেবে বিশ্বাস করি। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামনে খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্ম এমনভাবে উন্মুক্ত করেছেন যে, সেই তত্ত্বজ্ঞানের পানীয়, যা আমাদেরকে পান করানো হয়েছে, তা থেকে আমরা একটি বিশেষ স্বাদ পাই, যার ধারণা তারা ব্যতীত অন্যরা কখনোই লাভ করতে পারে না, যারা এই প্রস্রবণ থেকে পান করে পরিতৃপ্ত হয়।" **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত।)**

অতএব, আমাদেরকে যারা খতমে নবুয়্যতের অস্বীকারকারী মনে করে, তারা নিজেরা অন্ধ, তাদের হৃদয় অন্তঃসারশূণ্য। কেবল জয়ধ্বনী দেয়া আর নৈরাজ্য ও ভাঙ্গচুর করা ছাড়া তাদের কাছে আর কী-ইবা আছে? আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এখন ইসলামের যে বাণী বিশ্বময় প্রচার করে চলেছে, তা কি এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, হযরত খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মতের জন্য কৃত দোয়া থেকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তই অংশ পাচ্ছে।

পুনরায় খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্ম তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই নবী (সা.) দিয়েছেন, যিনি খাতামুল মু'মিনীন, যিনি খাতামুল আ'রেফীন এবং খাতামুন্নাবীঈন। অনুরূপভাবে সেই গ্রন্থ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্ণতম গ্রন্থ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রসূলুল্লাহ্ (সা.), যিনি খাতামুন্নাবীঈন, তাঁর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নবুয়্যত এভাবে সমাপ্ত হয় নি, যেভাবে কেউ কাউকে গলা টিপে হত্যা করে। এভাবে শেষ হওয়া প্রশংসার কারণ নয়। মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের সমাপ্তির অর্থ হল, সহজাত বা প্রকৃতগতভাবে তাঁর সত্তায় নবুয়্যতের বৈশিষ্টাবলী চরম ও পরম মার্গে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব, যা আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে ঈসা (আ.) পর্যন্ত সকল নবীকে দেয়া হয়েছে, কাউকে কোনটি, অন্য কাউকে আবার অন্য কোনটি, কিন্তু এর পুরোটাই মহানবী (সা.)-এর সত্তায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতিগতভাবে তিনি খাতামুন্নাবীঈন সাব্যস্ত হয়েছেন। অনুরূপভাবে, সকল প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা, নসীহত এবং তত্ত্বজ্ঞান, যা বিভিন্ন বই-পুস্তকে বিদ্যমান, তা পবিত্র কুরআনের মাঝে পূর্ণতার পরম রূপ পেয়েছে আর এভাবে কুরআন খাতামুল কুতুব গণ্য হয়।" **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৩৪২, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত।)**

পুনরায়, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে চিরঞ্জীব রসূল, এ আঙ্গিকে মহানবী (সা.)-এর সম্মান এবং মর্যাদার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "বনী ইসরাঈলের অবশিষ্ট ইহুদিই হোক বা হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা মান্যকারী খ্রিস্টানই হোক, তাদের মাঝে এমন কেউ কি আছে, যে এসব নিদর্শনের ক্ষেত্রে আমার মোকাবিলা করতে পারে। আমি ঘোষণা দিয়ে বলছি, একজনও নেই। এটি আমাদের মহানবী (সা.)-এর অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শনেরই প্রমাণ। কেননা, এটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, মহামান্য নবীর কোন অনুসারীর মাধ্যমে যেসব নিদর্শন প্রদর্শিত হয়, তা সেই নবীর নিদর্শন বলেই গণ্য হয়। অতএব, যেসব অলৌকিক নির্দশন আমাকে দেয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর যেসব অসাধারণ নিদর্শন আমার জন্য প্রকাশ করা হয়েছে, তা আসলে মহানবী (সা.)-এরই জীবন্ত ও জ্বলন্ত নিদর্শন। অন্য কোন নবীর অনুসারী আজ এটি নিয়ে গর্ব করতে পারবে না যে, সে-ও তার নিজের মাঝে মহামান্য নবীর আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করতে পারে। এই গর্ব শুধুই ইসলামের। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায়, চিরঞ্জীব রসূল শুধু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই হতে পারেন, যার পবিত্র নিঃশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে সকল যুগে খোদপ্রেমী এক ব্যক্তি খোদাকে দর্শন করানোর প্রমাণ দিতে থাকে।" **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৩-৪১৪, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত।)**

পুনরায় মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা এবং সম্মান, তাঁর বিনয় আর খোদা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য তাঁর ভালোবাসায় বিলীন হওয়া সম্পর্কে খোদার উক্তির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.) বলেন, "হাদীসে এসেছে, যদি ফযল এবং কৃপা লাভ না হয়, তাহলে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। (খোদার কৃপাগুণেই মুক্তি লাভ হয়।) অনুরূপভাবে, হাদীস থেকে এও জানা যায়, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) [মহানবী (সা.)-কে একবার জিজ্ঞেস করেছেন,] হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনারও কী একই অবস্থা? [অর্থাৎ, তিনি (সা.) এই যে বলেছেন, খোদার কৃপা লাভ না হলে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। আপনার ক্ষেত্রেও কী এটি সত্য?] মহানবী (সা.) তার মাথায় হাত রাখেন এবং বলেন, হ্যাঁ।" তিনি (আ.) বলেন, "এটি ছিল খোদার প্রতি মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ দাসত্বেরই বহিঃপ্রকাশ, যা খোদা তা'লার রবুবিয়্যত বা প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যকে আকর্ষণ করছিল।" এরপর তিনি (আ.) বলেন, "আমরা স্বয়ং এটি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বার বার পরীক্ষা করেছি, বরং সব সময় এটিই দেখি, বিনয় এবং নম্রতা যখন পরম মার্গে পৌঁছে এবং আমাদের আত্মা যখন এই দাসত্ব ও বিনয়ে বিগলিত হয় আর খোদা তা'লার আস্তানায় গিয়ে পৌঁছে, তখন ঊর্ধ্বলোক থেকে এক জ্যোতি এবং আলো অবতীর্ণ হয় আর এমন মনে হয়, যেন একটি নলের মাধ্যমে স্বচ্ছ পানি অপর একটি নলে প্রবেশ করে। অতএব, মহানবী (সা.)-এর অবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে বিনয় এবং নম্রতায় পরম মার্গে উপনীত যতটা মনে হয়, সেখানে এটি বুঝা যায় যে, তিনি (সা.) রুহুল কুদুসের সাহায্যে ততটাই সাহায্যপুষ্ট এবং আলোয় আলোকিত, যেমনটি আমাদের মহানবী (সা.) কার্যতঃ এবং ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শন করেছেন। এমন কি তিনি (সা.)-এর জ্যোতি এবং কল্যাণের গণ্ডি এতটা বিস্তৃত যে, এর দৃষ্টান্ত এবং প্রতিচ্ছবি অনন্তকাল পর্যন্ত দেখা যায়। কাজেই, এ যুগে খোদা তা'লার যত কল্যাণ এবং কৃপাবারি বর্ষিত হচ্ছে, তা তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর অনুসরণের কল্যাণেই লাভ হয়।" তিনি (আ.) বলেন, "আমি সত্যই বলছি, মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে বিলীন না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি প্রকৃত পুণ্যবান ও খোদার সন্তুষ্টিভাজন গণ্য হতে পারে না আর সেসব নিয়ামত, কল্যাণ, তত্ত্বজ্ঞান এবং দিব্য দর্শনে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারে না, যা অতি উচ্চ পর্যায়ের আত্মশুদ্ধির স্তরে লাভ হয়। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার কিতাবেই এর প্রমাণ দেখা যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (সূরা আলে ইমরান: ৩২) (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩-২০৪, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত।) অর্থাৎ, যদি খোদার ভালোবাসার প্রত্যাশী হয়ে থাক তবে, মহানবী (সা.)-এর মুখে ঘোষণা করিয়েছেন, তাঁর অনুসরণ কর, তবেই খোদার ভালোবাসা লাভ হবে।

এরপর মহানবী (সা.) এবং পবিত্র কুরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "পূর্বেও আমি বেশ কয়েকবার বর্ণনা করেছি আর এখনো এটি বলা অত্যুক্তি হবে না, তাই আমি বলতে চাই, আল্লাহ্ তা'লা যে নবীদের প্রেরণ করেন আর শেষে যে তিনি মহানবী (সা.)-কে জগদ্বাসীর হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন এবং পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন, এর কারণ কী? প্রত্যেক ব্যক্তি যখন কোন কাজ করে, সেই কাজের পেছনে কোন না কোন

উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে। এই কথা মনে করা যে, কুরআন নাযিল করা বা মহানবী (সা.)-এর প্রেরণের পিছনে খোদার কোন উদ্দেশ্য নেই, এটি চরম অবমাননা এবং শিষ্টাচার বহির্ভূত বৈকি! কেননা, এতে (নাঊযুবিল্লাহ্) একটি বৃথা কাজ খোদার প্রতি আরোপিত হয়। অথচ খোদা তা'লার সত্তা অতিশয় পবিত্র, (সুবহানাহু ওয়া তা'লা শানুহু)। অতএব, স্মরণ রেখো! পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা এবং মহানবী (সা.)-কে প্রেরণের পিছনে খোদার উদ্দেশ্য হল, পৃথিবীর সামনে তাঁর অসাধারণ রহমতের নিদর্শন প্রদর্শন করা, যেমনটি তিনি বলেছেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (সূরা আল্-আম্বিয়া: ১০৮)। অনুরূপভাবে কুরআন অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (সূরা আল্ বাকারা: ০৩)। এগুলো এমন মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যার সমকক্ষ কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত।)**

এরপর কুরআনের সুমহান মর্যাদা এবং পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন ঐশী গ্রন্থের যাবতীয় উৎকর্ষের সমাহার রয়েছে। এগুলো শুধু অতীতের গল্প-কাহিনী হিসেবে বর্ণনা করা হয় নি বরং মু'মিনের আমলের জন্য বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন, বিভিন্ন নবীর মাঝে যেসব উৎকর্ষতা ছিল, তিনি যেন মহানবী (সা.)-এর সত্তায় এর সমাহার ঘটান। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন গ্রন্থে যেসব গুণাগুণ ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, তা কুরআনে সন্নিবেশ করে দেন আর একইভাবে সকল উম্মতের মাঝে যত সব মহিমাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল তা এই উম্মতের মাঝে সমবেত করেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা চান, আমরা যেন এসব শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করি। আর এ কথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, যিনি আমাদেরকে সেই পরম-শ্রেষ্ঠত্বের উত্তরাধিকারী বানাতে চান, সে অনুপাতে শক্তিবৃত্তিও তিনি আমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন। কেননা, সেই অনুপাতে যদি শক্তিবৃত্তি দেয়া না হতো, তাহলে সেসব শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের জন্য পাওয়া সম্ভবই হতো না। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি কিছু লোককে নিমন্ত্রণ জানায়, তবে তার জন্য আবশ্যক, আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা অনুসারে খাবার প্রস্তুত করা এবং তদনুসারে জায়গারও সংকুলান থাকা। (অর্থাৎ, দাওয়াতের জন্য জায়গাও যেন থাকে)। এটি হতে পারে না যে, এক হাজার ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করবে আর তাদেরকে বসানোর জন্য ছোট্ট একটি কামরা বা ঘর বানাবে। (দাওয়াত করবে হাজার মানুষকে আর জায়গা রাখবে ছোট) না, বরং সে সেই সংখ্যার ব্যাপারে পুরো সচেতন থাকবে, (তাদের বসার জায়গাও সেই অনুপাতেই করতে হবে।) অনুরূপভাবে খোদার গ্রন্থও একটি নেমন্তন্ন বা আতিথেয়তার মত। (কুরআন একটি নেমন্তন্ন বা আতিথেয়তা সদৃশ।) এর জন্য সমগ্র পৃথিবীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, (এ নিমন্ত্রণ তথা শরীয়তের বিধি-বিধান সমগ্র পৃথিবীর জন্য।) এই নেমন্তন্নের জন্য খোদা তা'লা যে ঘর প্রস্তুত করেছেন তা হল, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।" [মানুষের মাঝে যে সব শক্তি-নিচয় রয়েছে, তা হল সেই বসার স্থান। তাই, মানুষের জন্য একথা বলা যে, আমরা

কুরআনের অমুক নির্দেশ মেনে চলতে পারি না, এটি কঠিন, এমন ধারণা পোষণ করা ভুল। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সেসব শক্তিবৃত্তি দিয়েছেন, যার দ্বারা আমল করা সম্ভব হবে। তিনি (আ.) আরো বলেন,] "তাদেরকে অর্থাৎ, এই উম্মতকে যা কিছু দেয়া হয়েছে," (সেসব প্রকৃত মুসলমান, যারা বিশুদ্ধ চিত্তে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদেরকে এ শক্তিবৃত্তি দেয়া হয়েছে।) তিনি (আ.) বলেন, "শক্তিবৃত্তি ছাড়া কোন কাজ সাধিত হতে পারে না।" তিনি (আ.) আরো বলেন, "এখন যদি ষাড়, কুকুর বা অন্য কোন প্রাণীর সামনে কুরআনের শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়, তাহলে তাদের জন্য তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কেননা, তাদের ভেতর কুরআনের শিক্ষা বহনের জন্য যে শক্তিবৃত্তি তা নেই। কিন্তু খোদা তা'লা আমাদেরকে সেই শক্তিবৃত্তি দিয়েছেন, যেন আমরা সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারি। **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০-৩৪১, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত।)**

অতএব, এ কথা বলে মানুষ যদি নিজেকে পশু মনে করে যে, আমার ভেতর শক্তিবৃত্তি নেই, কুরআনের শিক্ষা মেনে চলার শক্তি ও সামর্থ্য নেই, (তবে এমন ধারণা ঠিক নয়।) আল্লাহ্ তা'লা একজন মুসলমানকে সত্যিকার অর্থেই সেই শক্তিবৃত্তি দিয়েছেন। কুরআনের নির্দেশ পালনের জন্য সেগুলোকে কাজে লাগানোর দায়িত্ব মানুষের নিজের।

মুসলমানদের আচার-আচরণ কেমন? ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর জন্য তিনি (আ.) কতটা আত্মাভিমান রেখে নসীহত করেছেন? আর এই যুগে সবচেয়ে বড় ইবাদত কী, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "এক মুসলমানের জন্য আবশ্যিক দায়িত্ব হল, এ যুগে ইসলাম যেসব নৈরাজ্যের সম্মুখীন, তা দূরীভূত করার ক্ষেত্রে কিছুটা ভূমিকা রাখা। আর বড় ইবাদত হল, এ সব নৈরাজ্য দূর করার ক্ষেত্রে সকল মুসলমানের কিছু না কিছু ভূমিকা রাখা। অর্থাৎ, এখন যেসব পাপ ও অবমাননাকর বিষয়াদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেগুলোকে নিজের বক্তৃতা ও জ্ঞানের মাধ্যমে এবং খোদা প্রদত্ত সকল শক্তিবৃত্তিকে নিষ্ঠার সাথে কাজে লাগিয়ে ধরাপৃষ্ঠ থেকে দূর করা। এ পৃথিবীতেই কেউ যদি আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, তবে এতে তার কী লাভ? এ দুনিয়াতেই কোন মর্যাদা লাভ করলে তার কী এমন লাভ হল? পারলৌকিক প্রতিদান বা পুরস্কার লাভের চেষ্টা কর, যার কোন সীমা নেই। সকল মুসলমানের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ এবং তৌহীদের জন্য সেইভাবে আত্মাভিমান থাকা উচিত, যেভাবে নিজের একত্ববাদের জন্য খোদা তা'লার আত্মাভিমান রয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা করে বল, পৃথিবীতে এমন নির্যাতিত কোথায় আছে, যতটা নির্যাতিত ছিলেন আমাদের নবী (সা.)? এমন কোন আবর্জনা, গালি এবং জঘণ্য নাম নেই, যা তাঁর প্রতি আরোপ করা হয় নি! এটি কী মুসলমানদের জন্য মুখে কুলুপ এঁটে করে বসে থাকার সময়? এখনো যদি কোন ব্যক্তি দণ্ডায়মান না হয় আর সত্যের পক্ষে সত্য সাক্ষ্য দিয়ে মিথ্যাবাদীর মুখ বন্ধ না করে আর কাফিররা আমাদের নবী (সা.)-এর প্রতি নির্লজ্জতার সাথে অপবাদ আরোপ করবে এবং মানুষকে

বিভ্রান্ত করতে থাকবে, এটিকে যদি সে সহ্য করে, তাহলে তোমরা স্মরণ রেখো! এমন ব্যক্তি কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। নিজের যতটা জ্ঞান ও জানাশোনা রয়েছে, তোমাদের উচিত এ পথে তা ব্যয় করা।" (তোমাদের মাঝে ধর্মের যতটা জ্ঞান আছে, তা এই পথে ব্যয় কর।) "মানুষকে সমস্যার কবল থেকে মুক্ত কর। হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, তোমরা যদি দাজ্জালকে বধ না-ও কর, তবুও সে মরবেই। এ প্রবাদটি প্রসিদ্ধ যে, **'হার কামালে রা যাওয়ালে'** (অর্থাৎ, চূড়ায় পৌঁছার পর, পতন তো একদিন অবশ্যম্ভাবী)। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই এসব বিপদের সূচনা হয়েছে। এখন এর ধ্বংসের সময় সন্নিকট। তাই প্রত্যেক মুসলমানের আবশ্যিক দায়িত্ব হল, মানুষকে জ্যোতি ও আলো দেখানোর জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করা। **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত।)**

যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, এই আলো এবং জ্যোতির প্রসার ও প্রচারের জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। আমরা তাঁর হাতে বয়আত করেছি, এটি আমাদের সৌভাগ্য। এই কাজকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব এখন আমাদের উপর।

বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে তাঁর একটি ইলহামের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সেই ইলহামটি হল, **"সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন, ওয়া আলে মুহাম্মাদীন, সাইয়্যেদে উলদে আদম, ওয়া খাতামান্নাবীঈন**। অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশের প্রতি দরূদ প্রেরণ কর, যিনি আদম সন্তানের নেতা এবং খাতামান্নাবীঈন (সা.)।" তিনি (আ.) বলেন, "এটি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, এসব উচ্চ মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং পুরস্কার তাঁর কল্যাণেই লাভ হয় আর তাঁকে ভালোবাসারই পুরস্কার এটি। সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সেই দু'জগতের সর্দারের কতই না উচ্চ মর্যাদা এবং নৈকট্যের অধিকারী যে, তাঁর প্রেমিক খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত হয় আর তাঁর সেবক সারা পৃথিবীর সেবায় ধন্য হয়।

هیچ محبوبے نماند ہیچو یار دلبرم

مہر و مہ را نیست قدرے در دیار دلبرم

آں کجا روئے کہ دارد ہیچو رویش آب و تاب

واں کُجا باغے کہ ے دارد بہار دلبرم

অর্থাৎ, আমার প্রেমাস্পদের মত কেউ নেই, তাঁর মোকাবিলায় চন্দ্র-সূর্যের কোনই মূল্য নেই, তাঁর চেহারার মত ঔজ্জ্বল্য রাখে এমন চেহারাই বা কোথায় আর এমন বাগান কোথায় যাতে আমার প্রেমাস্পদের ন্যায় বসন্ত বিরাজ করে।

দরূদ শরীফ কোন উদ্দেশ্যে পড়া উচিত এই কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "দরূদ শরীফ ... এ উদ্দেশ্যে পড়া উচিত, যেন খোদা তা'লা তাঁর পরম উৎকর্ষপূর্ণ কল্যাণরাজি তাঁর মহান নবীর প্রতি অবতীর্ণ করেন। আর সমগ্র বিশ্বের জন্য তাঁকে যেন কল্যাণের উৎসস্থলে পরিণত করেন। তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও মহিমা যেন উভয় জগতে প্রকাশ করেন। এই দোয়া পূর্ণ বিনয়ের সাথে করা উচিত, যেভাবে সমস্যা কবলিত কোন মানুষ বিগলিত চিত্তে দোয়া করে থাকে।" (দরূদ শরীফ পড়ার সময় মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদার জন্য ঠিক সেভাবে দোয়া করা উচিত, যেভাবে মানুষ সমস্যায় জর্জরিত হলে দোয়া করে।) "বরং আরো বেশি আহাজারি আর আকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করা উচিত। নিজের কোন স্বার্থ এর মাঝে জড়িত থাকা উচিত নয়।" [তিনি (আ.) বলেন, এ দোয়ার মাঝে নিজের জন্য কিছু রাখা উচিত নয়] অর্থাৎ, এর মাধ্যমে আমি এ সওয়াব বা পুণ্য পাব অথবা এ মর্যাদা লাভ করব। বরং নিখাদ এ উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত যে, পরম উৎকর্ষপূর্ণ ঐশী কল্যাণরাজী মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হোক, তাঁর প্রতাপ যেন ইহকাল ও পরকালে জ্যোতির্ময় রূপে প্রকাশ পায়। **[মকতুবাতে আহমদ (আ.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৩, সংস্করণ ২০০৮ইং]**

অতএব, শত্রু আমাদেরকে যা-ই বলুক না কেন আর আমাদের প্রতি যে অপবাদই আরোপ করুক না কেন, আমাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি খাঁটি ভালোবাসা বিরাজমান এবং তাঁর খাতামান্নাবীঈন হওয়া সংক্রান্ত জ্ঞান আমাদের সবচেয়ে বেশি রয়েছে। এসব কিছুই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দান করেছেন। আল্লাহ্ করুন, শত্রুর প্রতিটি আক্রমণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের ঘটনার পর আমরা যেন ঈমানে অধিক অগ্রগামী হই এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি যেন পূর্বের তুলনায় অধিক হারে দরূদ প্রেরণ করতে পারি, যার ফলে সাধারণ মুসলমানরাও যেন তাঁর এই মর্যাদার সঠিক উপলব্ধি লাভ করে আর এসব বিভ্রান্ত মুসলমান যেন সঠিক পথে ফিরে আসে এবং পৃথিবীতে ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষার যেন বিস্তার ঘটে।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত